৭১৬।০৭

প্রতিধ্বনি

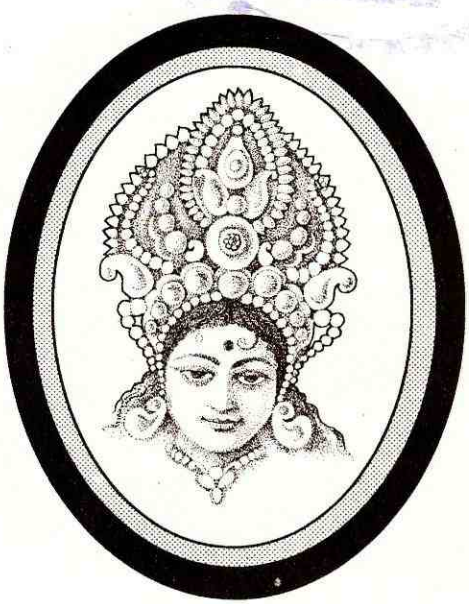

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও
২০০৪-২০০৫

প্রতিধ্বনি
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
গুয়াহাটী-৭৮১০১১

তৃতীয় প্রকাশ ঃ
৯ আগষ্ট,২০০৫

ছাপা ঃ
অফ্‌ছেট ডিজাইন ইণ্ডিয়া
বাটা বিল্ডিং, মালিগাও চারিয়ালি
গুয়াহাটী-১১

সূচীপত্র

১। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে বাংলা সাময়িক পত্রের ভূমিকা
—দীপান্বিতা দেব ৫
২। বর্তমান যুগে বুদ্ধ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা
—কাবেরী পাল ৭
৩। মানব সমাজ ও পরিবেশ
—শরদ্বিন্দু চৌধুরী ৮
৪। মধুসূদনের নাট্যতত্ত্ব
—স্বর্ণকমল রায় ১০
৫। লঙ্কেশ্বর
—রীণা মণ্ডল ১২
৬। বাংলা প্রবাদে কাক
—ডঃ সুনন্দা দাস ১৩
৭। আকাশ ছুঁতে চাই
—রূমকী দাস ১৫
৮। শেফালির ফুল নিয়ে
—নীলিমা গোস্বামী শর্মা ১৬
৯। গোলাপ ফুল
—রূপা ভৌমিক ১৬
১০। ২৬ শে ডিচেম্বর, ২০০৪
—শিবানী দে ১৭
১১। মুখোশ
—হিমাদ্রী রায় ১৮
১২। সকালে ফুটবে ফুল
—অরূণাভ ঘোষ ১৯
১৩। বলতে পারো?
—রূপা ভৌমিক ১৯

সম্পাদকীয়

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দ্বারা প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'প্রতিধ্বনি' তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। প্রথম দুটি সংখ্যা হাতে লেখা ছিল বলে এর বেশীদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারিনি। ছাত্র-ছাত্রী ও শুভাকাঙ্খীদের আগ্রহ ও শুভেচ্ছা নিয়ে এবছর থেকে প্রতিধ্বনি আমরা ছাপা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টিশীল এবং মননশীল লেখাকে উৎসাহিত করা ও সেই সঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দুই একটি লেখা প্রকাশ করা। ভাষা ও সাহিত্যকে শুধুমাত্র শ্রেণীতে আবদ্ধ করে রাখা যায়না। ছাত্র-ছাত্রী ও সেই সঙ্গে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পাঠ্যপুঁথির বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে এসে বাইরের জগৎ কে দর্শন করা অতি প্রয়োজন। পত্রিকাতে আমরা সেই ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছি।

গত দুটো সংখ্যায় মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে পাওয়া সহযোগ আমাদের যথেষ্ট উৎসাহিত ও উপকৃত করেছে। এই সঙ্গে আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাছি। আমরা বিশেষভাবে মহাবিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নীলিমা গোস্বামী শর্মা মহোদয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি গত তিন বৎসর ধরে বাংলাতে লেখা কবিতা প্রতিধ্বনিতে প্রকাশের জন্য দিছেন।

আমরা বিশ্বাস রাখি যে অদূর ভবিষ্যতে পত্রিকাটিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মাসিক পত্রিকা হিসাবে গড়ে তুলতে পারবো।

—ডঃ সুনন্দা দাস

বাংলা গদ্যের বিবর্তনে বাংলা সাময়িক পত্রের ভূমিকা

দীপান্বিতা দেব
স্নাতক প্রথম বর্ষ

বাংলা গদ্যের বিবর্তনে বাংলা সাময়িক পত্রের এক বিরাট ভূমিকা আছে। গদ্যভাষার প্রচলনের দ্বারাই বাংলায় নবজাগরণ এসেছিল। এবং এই গদ্যের উন্নতির জন্য সাময়িক পত্রের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত পদ্য, গল্প, প্রবন্ধ, মতামত, সমালোচনা, খবরাদি জনসাধারণকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করেছিল। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা হ'ল 'সমাচার দর্পণ'— এটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই 'বাঙ্গাল গেজেট' ও 'সমাচার দর্পন'— এই দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'দিগদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলি শুধু যে সংবাদ প্রকাশ করেছে তাই নয়, তৎকালীন বাঙালী সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম-সবকিছু সম্পর্কেই তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ থেকে নানা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার প্রচলন হলেও প্রথম দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সালে। পত্রিকার নাম হল সংবাদ প্রভাকর এবং সম্পাদক হলেন ঈশ্বর গুপ্ত। এই পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক, তারপর সপ্তাহে তিনবার, এবং শেষে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর মিশনারীদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পন' মার্শম্যানের সম্পাদনায় ও এদেশের পণ্ডিতদের সহায়তায় ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতে প্রায় সময়ই হিন্দুধর্ম ও সমাজকে অকারণে গালিগালাজ করা হত। তাই ১৮২১ সালে রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ মিশ্র 'সম্বাদকৌমুদী' মামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে এই আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব দেন। পরে রামমোহনের আধুনিক ও প্রগতিশীল মনোভাবের সঙ্গে কিছু রক্ষণশীল স্বভাবের ভবানীচরণের মতের অমিল হওয়ায় ভবানীচরণও রামমোহনের মতভেদ হয়ে যায়। এরপর ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে ১৮২২ সালে

একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সম্বাদকৌমুদী যুক্তি ও প্রগতির পথ ধরল, অন্যদিকে সমাচার চন্দ্রিকা চিরাচরিত সংস্কারের পথ ধরল।

উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়াও 'গসপেল ম্যাগাজিন'— খ্রীষ্টান সমাজের জন্য ১৮১৯ সালে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা, ১৮২১ সালের রামমোহনের সম্পাদিত ব্রাহ্মণ সেবধি, জীবজন্তু বিষয়ক পত্রিকা 'পশ্বাবলী' ১৮২২ সালে প্রকাশিত হয়। হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রেরা ১৮৩১ সালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক পত্রিকার সূত্রপাত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাময়িক পত্রের আলোচনা করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে কিছু কথা না বললে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। ১৮৩১ সালে যখন সংবাদ প্রভাকর প্রথম প্রকাশ পায় তখন সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের বয়স মাত্র উনিশ। এই নিঃস্ব নবযুবককে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে উৎসাহিত করেছিলেন। তার সঙ্গে দরিদ্র সন্তান ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একবার যোগেন্দ্রনাথের আর্থিক অনাটনের জন্য পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবার প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রাচীন ও নবীন উভয়ের সংযোজক ছিল। এটিই বাঙালীর প্রথম মাসিক পত্রিকা, যাতে সাহিত্য রচনার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর অনেক সাহিত্যিকই ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকায় প্রথম হাত পাঁকিয়েছিলেন।

যাই হোক সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রকাশের পূর্বে বাংলা গদ্যে যে জড়তা ছিল,সেই জড়তা থেকে গদ্যভাষা মুক্তি পেয়ে আজকের রূপ প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ধরণের তর্ক, সমালোচনা ইত্যাদি স্বল্প শিক্ষিত বাঙালীর জন পত্রিকাতে প্রকাশ করার ফলে গদ্য ভাষাকে যতটুকু সম্ভব সবল করার চেষ্টা তখন থেকেই করা হচ্ছিল, সুতরাং বাংলা গদ্যের সরলীকরণে উপরোক্ত পত্রিকাগুলির অবদান স্বীকার করতেই হবে।❑❑

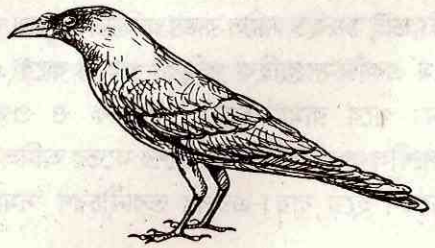

বর্তমান যুগে বুদ্ধ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা

কাবেরী পাল
স্নাতক প্রথম বর্ষ

ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এবং মানব ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় যার নাম আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, যিনি পৃথিবীর অগনন হৃদয়কে জয় লাভ করে রেখেছেন এবং ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের অন্ধ মোহ পরিহার করে যিনি মানবজাতির অশেষ দুঃখ দূর করার জন্য সমস্ত ধরণের স্বল্পকালীন ব্যক্তিগত সুখ-ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিহার করে মহান উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, তিনি হলেন ভগবান বুদ্ধদেব। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রচারিত তার ধর্ম, দর্শন, জীবপ্রেম, অহিংসা, সহজ ও সরল জীবন যাপনের শিক্ষা, ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ, আজও নষ্ট হয়ে যায়নি।

ভগবান বুদ্ধের জীবনী কারো অপরিচিত নয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল খৃঃপূঃ ১৫৬৭ সনে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সিদ্ধার্থ, তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোধন ও মাতার নাম মায়াদেবী। অতি শৈশবকাল থেকেই মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে সিদ্ধার্থের মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। অন্যান্য বালকদের মতো খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তাঁকে সংসারে আবদ্ধ রাখার জন্য মাত্র ষোল বছর বয়সে বিবাহ করানো হ'ল। রাহুল নামে এক পুত্র সন্তানের পিতাও তিনি হলেন, কিন্তু যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন মানব জাতির উদ্ধারের জন্য তাকে কি করে ক্ষুদ্র সংসারে আবদ্ধ রাখা যাবে? তাই ২৯ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে 'উরুবেলা' নামক একটি জঙ্গলে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরণে উপাসনা করতে শুরু করলেন। তিনি প্রথমে দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে কৃচ্ছসাধনা শুরু করলেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে শরীরকে কষ্ট দিয়ে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। তিনি এরপর নূতন করে সাধনা করার জন্য গয়ার নিকট এক বটবৃক্ষের নীচে সাধনা আরম্ভ করলেন। এখানে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। এই পরম জ্ঞান অর্থাৎ 'বোধ' লাভ করার জন্যই তাঁর নাম 'বুদ্ধ'— এই শব্দের অর্থ হ'ল অনন্ত ও অসীম জ্ঞান। বুদ্ধদেবের ধর্মতত্ত্বকে রাজর্ষি অশোক প্রথম দেশে ও দেশের বাইরে প্রচার করেছিলেন।

বর্তমান সমাজে বুদ্ধের দর্শন ও শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব হ'ল অহিংসা— অর্থাৎ তুমি নিজে বাঁচো এবং অন্যকেও বাঁচতে দাও। আজ হিংসার লেলিহান শিখা সর্বত্রই পরিদৃশ্যমান। একদিকে আমরা বুদ্ধদেবকে নিয়ে গৌরব অনুভব করি, অপরদিকে আমরাই তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করিনা। তাই, শুধুমাত্র বুদ্ধদেবকে জানলেই হলে না, তাঁর দর্শন মুখস্থ করে যশ ও খ্যাতি অর্জন করলেই হবেনা, তার দর্শনক হৃদয়ে স্থান দিতে হবে।❑❑

মানব সমাজ ও পরিবেশ

শরদ্বিন্দু চৌধুরী
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

যে পারিপার্শ্বিক আমাদের দেহ মনকে প্রভাবিত করে তাকেই আমরা পরিবেশ বলে জানি। জীবের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে বহু অতিকায় প্রাণী প্রকৃতির বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পিপিলিকার মত বহু ক্ষুদ্র প্রাণী একমাত্র পরিবেশকে সহ্য করে থাকার ফলেই টিকে আছে। সুতরাং প্রত্যেকের বেঁচে থাকাটাই পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি হ'ল— সুর্যের আলো, বাতাস, মাটি ও জল। এই উপাদানগুলো নিয়ে বর্তমানের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আশংকা প্রকাশ করেছেন। বর্তমানের মানব সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে আসীন, তখন জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হচ্ছে, এবং এর ফলেই অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে সুস্থ জীবন যাপনের আশা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব সমগ্র বিশ্বে এক নূতন দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। বৈজ্ঞানিকদের সাধনায় নানা যন্ত্রের আবিস্কার হ'ল, শুরু হ'ল মানব জাতির জয়যাত্রা। জড় প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য স্থাপিত হ'ল। কিন্তু এই যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে সুখ ও আরামের সন্ধান দিলেও মানব সভ্যতা এক চরম সংকটের সম্মুখীন— যন্ত্রদানবের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পৃথিবীর শ্যামল সুষমা আজ বিবর্ণ। শুধু মানুষই নয়, তাজমহলের সৌন্দর্য, অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্র, ক্ষুদ্র বৃহৎ হ্রদ-উপহ্রদও এই বিষাক্ত পরিবেশের শিকার।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়। যেমন—*The wild life protection act of 1972, The water preservation and control of pollution act of 1974* । এছাড়াও আরো নানা ধরণের আইন প্রণয়ন করে বন্যজীবন ও বৃক্ষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

মানুষ পরমাণু শক্তিকে সৃষ্টির কাজে যতটুকু ব্যবহার করেছে তার থেকে বেশী ব্যবহার করেছে ধ্বংসের কাজে। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি অসীম

শক্তিশালী পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। *Green House Effect* এরই ফল। নিজেদের শক্তি পরীক্ষার জন্য তাদের এই পরীক্ষা নিরীক্ষা বায়ুমণ্ডল ও জীবজগতকে বিষাক্ত করে তুলছে। সভ্যতার চরম শিখরে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিছে নানা দুরারোগ্য ব্যধির প্রাদুর্ভাব। মানুষ আজ নানা অজানা রোগের শিকার, মানসিক ভারসাম্যহীন, বিকলাঙ্গ মানুষ আজ অসংখ্য। এমনকি মাতৃগর্ভের ভ্রূণও এর ফল ভুগছে।

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আজ সচেতন হবারসময় এসেছে। প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎকে সমূহ বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে। কল্যাণমুখী বৈজ্ঞানিক আবিস্কার দ্বারা বায়ুমণ্ডল শোধনের ব্যবস্থা হলে মানুষ দুরারোগ্য ব্যধির হাত থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাতেই এই দুরূহ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন পরিকল্পনাই সার্থক হতে পারে না। প্রকৃতি আজ দূষিত বস্তুতে ছেয়ে গেছে। মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতি উন্নত হলেও মানুষ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে না। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা পরিবেশকে দূষিত করতে বিশেষভাবে দায়ী। নানা যন্ত্রচালিত কল-কারখানাগুলি থেকে নির্গত বহু বিষাক্ত গ্যাস আমাদের পার্শ্ববর্তী পরিবেশকে দূষিত করছে। তাছাড়া প্রত্যেকের বাড়ীর আবর্জনা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় না রেখে পথের ধারে নিক্ষিপ্ত হয়। এই জঞ্জাল কোথাও কাথাও পর্বতপ্রমাণ হয়ে পরে থাকতে দেখা যায়।

ভারতের পরিবেশ দূষণের প্রধানতম উপাদান হচ্ছে *Plastic* এবং এর তৈরী বিভিন্ন জিনিষ। যেমন *Plastic carrybag* এইগুলো গৃহসঞ্চিত আবর্জনার মধ্যে মিশে থাকে। কখনও কখনও এর দ্বারা বাধাপেয়ে নালার জল রাস্তায় উঠে এসে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করে। তাছাড়া এইসব *Carrybag* কখনও মাটির সঙ্গে মিশে যায় না ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

যে গাছপালা ও বনসম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং পরিবেশ পরিশোধনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে, লোভী মানুষ নির্বিচারে সেই বৃক্ষকে ধ্বংস করে চলছে। এই বৃক্ষশূন্যতা বা *Deforestation* পৃথিবীর একটি বিরাট সমস্যা। আজ মাঠের শ্যামলিমাকে বিনষ্ট করে গড়ে উঠে ইটা-ভাটা। মাছের বদলে জলাশয়ে দেখা যায় আবর্জনা। এভাবে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই আজ কলুষিত। তাই জনসাধারণকেই সক্রিয় হতে হবে। বৃক্ষরোপন ইত্যাদি নানাধরণের পদ্ধতির সাহায্যে আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে।□□

মধুসূদনের নাট্যতত্ত্ব

স্বর্ণকমল রায়
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

মধুসূদন নাট্যতত্ব সম্বন্ধে কোথাও বিশদভাবে আলোচনা করেন নাই। তবে বিভিন্ন চিঠিপত্রে তাঁহার রচিত নাটক সমূহের একটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়। নাট্যকারের ধর্ম গ্রহণ করিবার পরে তিনি কয়েকটি কঠিন বাধার সন্মুখীন হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ নাট্যরস উপভোগের পিপাসা লোকের মনে ছিল, কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার কোন উপায় ছিল না। ধনী ব্যক্তিগন খেয়ালখুশি মত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নাট্যশালা নির্মান করিতেন। তাহাতে আমন্ত্রিত দর্শকগণের প্রবেশাধিকার ছিল মাত্র। সর্বসাধারণের সেখানে যাইবার কোন উপায় ছিল না। উপরন্তু সেই সকল প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা ধনীর সাময়িক উৎসাহের অবসানে একদিন অতর্কিতে বন্ধ হইয়া যাইত।

দ্বিতীয়তঃ মধুসূদন ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে জাতীয় নাটক মঞ্চে অভিনীত হয় তাহাদের মধ্যে নাট্যগুন বিশেষ কিছু নাই। ইহাদের নাট্যকাব্য বলা যায়। অনুরূপ মন্তব্য ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও করিয়াছিলেন। শেক্সপীয়ারের নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের নাটকের তুলনা করিয়া মধুসূদন এক পত্র লিয়িাছিলেন যে, আমাদের মধ্যে প্রবৃত্তির বেগ প্রবল নহে। আমাদের সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। স্বভাবতঃ সমাজ জীবনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আমাদের নাটক রচনা করিতে হইবে।

ট্র্যাজেডি নাটকে সচেতনভাবে কমেডির কোন দৃশ্য সংযোজন করা অনুচিত। তিনি ট্রাজেডিতে সরস দৃশ্য বা চরিত্রের সুসঙ্গত অবতারনা ব্যতীত ট্রাজেডি ও কমেডিকে মিশ্রিত করিতে চাহেন নাই। মধুসূদনের মতে *'never strive to be comic in a tragedy'* শেক্সপীয়রও এই রীতির বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন।

মধুসূদন তাঁহার নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মিলটনের কাব্যে উহার উদাত্ত সুর তিনি শুনিয়াছেন। কাব্য ব্যতীত ইহার সীমাবদ্ধ পরীক্ষা তিনি 'পদ্মাবতী' নাটকে করিয়াছেন। তাঁহার মতে গদ্য-সংলাপ অপেক্ষা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য-সংলাপ অধিকতর উপযোগী। তিনি ইহার জন্য য়ুরোপীয় নাট্যকারগণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মধুসূদন 'সুভদ্রা' নাট্যকাব্যের দুইটি অঙ্ক রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে-কোন ভাষার সাহিত্যে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইহা ছন্দোবদ্ধ কাব্য অপেক্ষা সুন্দর। একজন সত্যকার কবি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন। ছন্দের মধ্যে বন্ধন আছে। এই বন্ধন কোন মহৎ স্রষ্টা মানিয়া লইতে পারিবেন না। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের মধ্যে আছে সৌন্দর্য ও প্রবহমানতা আর ছন্দের আছে লালিত্য। এই লালিত্যের দ্বারা মানসিক দারিদ্রকে ঢাকিয়া রাখা যায়।

প্রসঙ্গতঃ নাট্য-তত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত আলোচনার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের ভ্রান্তিমূলক সংস্কারবশতঃ কথোপকথনে গ্রথিত ও অভিনীত অনেক গ্রন্থ নাটক নামে প্রচলিত। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ উপাখ্যান কাব্য। *Manfred or Faust* অথবা শকুন্তলা উপাখ্যান কাব্যমাত্র।

মধুসূদন রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গে দৃশ্যপট ব্যবহারের কথা বলায় রবীন্দ্রনাথ তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, কারণ ঐ সকল স্থানু বস্তু নাটকের গতিধারা ব্যাহত করে। কালিদাস ও শেক্সপীয়র সংলাপের সাহায্যে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দর্শকবৃন্দ রসাস্বাদন করিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানকালে বিলাতের অনুকরণে মঞ্চে যে দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয় তাহা দর্শকমনে রস গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

জীবনে ঐশ্বর্য আছে, দুঃখও আছে, ইহাদের মিলিত রূপের পরিচয় ট্রাজেডিতে পরিস্ফূট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলশ্রুতি জীবনবোধসঞ্জাত আনন্দের। আনন্দ এইহেতু যে আমরা ট্রাজেডি পাঠে বা দর্শনে সত্য ও সৌন্দর্যের পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। ইহার দর্শনে বা পাঠে আমাদের মনে আবেগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই আবেগ শুধু মাত্র সৌন্দর্য উপলব্ধিতে নহে, জীবন সত্যের পরিচয়ে তৃপ্ত হয়। মানবজীবনে বৈসাদৃশ্যের পরিচয় চরিত্রে ও আচরণে দেখিয়া যেমন আমরা আনন্দ পাই ও যেখানে তাহা পরিস্ফূট হয় তাহাকে কমেডি নাম দিয়া থাকি, তাহাই যখন আবার বিভিন্ন চরিত্রে সঙ্কল্পের সংঘাতে এবং ঘটনার আবর্তে উৎসারিত হইতে দেখি তাহাকে ট্রাজেডি নাম দেয়।

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীতে শেক্সপীয়রীয় ধারা অনুসরন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম ও চতুর্থ অঙ্কে লঘু রসাত্মক কাহিনীর অবতারনা করিয়া মূল কাহিনী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কে বিবৃত করিয়াছেন। তবে তাঁহার অভিনব রীতি হইল যে তিনি গৌন কাহিনীর দুইটি চরিত্রের দ্বারা মূল কাহিনীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাহারা অর্থাৎ ধনদাস ও মদনিকা মূল ধারায় কোন অংশ গ্রহণ করে নাই।□□

লঙ্কেশ্বর

রীণা মণ্ডল
উঃ মাঃ প্রথম বার্ষিক

বাংলা বিভাগ থেকে আমরা বার্ষিক শিক্ষামূলক ভ্রমণসূচীর অঙ্গ হিসাবে লঙ্কেশ্বর মন্দিরে গিয়েছিলাম ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে। মহাবিদ্যালয়ের এতোকাছে এতো মনোরম একটি স্থান যে থাকতে পারে আমাদের সঙ্গের অনেকেরই ধারণা ছিলনা। শীতের সকালে মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়েছিলাম সকলে। এতো কাছাকাছি জায়গায় যাওয়া হবে বলে অনেকেই ভারাক্রান্ত মনে এসেছে।

বাসে চেপে সকলে আধঘণ্টার ভেতর লঙ্কেশ্বর মন্দিরের নীচে বাসষ্টপে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের দেবতার নামেই সমগ্র অঞ্চলটি লঙ্কেশ্বর নামে পরিচিত। বাস থেকে নেমেই দেখতে পেলাম সামনে এক পাহাড়, উপরে উঠার জন্য পাকা সিড়ি একটি তোরণ ও আছে। নীচ থেকে মন্দির দেখা যায়না, বড় বড় গাছ আড়াল করে রেখেছে। সিড়ি দেখে অনেকেরই মাথা ঘুরে গেছে। প্রায় ৫০০ সিড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হবে (হিসেবে একের সঙ্গে অপরের মিলনেই) সিড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কারো গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কারো বা হাঁটু ধরে যাচ্ছে... এইভাবে গল্প করতে করতে কখন যে সকলে মন্দিরের সামনে চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি। নীচর দিকে তাকিয়ে ভীষণই অবাক লাগিছিল। সামনে বিশাল, পারাপারহীন ব্রহ্মপুত্র। কোথাও কোথাও মরুভূমির মতো চড়া। চারিদিকের অপূর্ব, মনোরম দৃশ্য দেখতে সিড়ি চড়বার কষ্টের কথা সকলেই ভুলে গিয়েছিলাম।

কিছু সময় এদিক ওদিক ঘোরাঘূরির পর মন্দির দর্শনের জন্য প্রস্তুত হলাম। দেবতা লঙ্কেশ্বর অর্থাৎ সদাশিব। কালিকাপুরাণে লঙ্কেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া কোনরকম ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনীর কথা পূজারীর জানা নেই বলে বললেন। পূজাঅর্চনার সামগ্রী মন্দিরের সামনে পাওয়া যায়। দেবতার দৈনিক পূজা হয় এছাড়া শিবরাত্রির দিন মেলা হয়। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। আমরা মন্দিরে পূজা দিয়ে আবার আশেপাশে ঘুরে, পাথরে বসে নীচের দৃশ্য উপভোগ করে দুঘণ্টা পর আবার সেই সিড়ি গুণতে গুণতে নীচে নামতে শুরু করলাম।

বাংলা প্রবাদে কাক

ডঃ *সুনন্দা দাস*
বাংলা বিভাগ

মানব জীবনের দীর্ঘদিনেরে অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্রতম বাঙ্ময় প্রকাশই হলো প্রবাদ। প্রবাদের সাহায্যে একটি জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রবাদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, রীতি-নীতি নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই।

বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ধরণ ও বরণের পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গে দিয়ে আমাদের আকর্ষিত করে। বহুলভাবে নাহলেও বাংলার লোকগাথা, গীত, ছড়া, প্রবাদে এরা স্থান পেয়েছে। পক্ষকূল রঙের বাহার, কণ্ঠস্বর বা স্বভাবের বৈচিত্রের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী এসেছে মানব চরিত্রের সমালোচনা ও বিশ্লেষণে রূপকার্থে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্টেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবাদে পক্ষীকূলের মধ্যে সংখ্যারদিক থেকে কাকের স্থান প্রথম। কাক সর্বজন পরিচিত। আমাদের ঘুম ভাঙে 'কাকবিহানে'। তাই অতি প্রত্যুষ বোঝাতে কাক এসেছে। কালোরঙের , কর্কশ স্বরের, চতুর পক্ষীটি আমাদের রোজকার জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘণিষ্টভাবে জড়িয়ে আছে। সংসারের আবর্জনা, নোংরা পরিস্কার করলেও সংখ্যা ও স্বভাবের জন্য এই পাখিটি আমাদের সকলের অবহেলার ও অপছন্দের। কাক ও কোকিল দুই ই কালো, কিন্তু কণ্ঠস্বরের জন্য দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাই প্রবাদে পাই— *কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশা, বামন হয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা।*

মানুষের অর্থহীন প্রযত্নের কথা এখানে বলা হয়েছে। কাককে আমরা সর্বভূক বলে জানি, সব রকমের মাংস খায় কিন্তু মরাকাকের মাংস কোনো প্রাণী খায়না—

'কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায়না" এই প্রবাদটিতে সেই সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা অন্যের সাহায্য গ্রহণ করে কিন্তু পরের সুখ সুবিধা অগ্রাহ্য করে। কাককে কেউ বিশ্বাস করে না বলেই 'কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা' প্রবাদটি প্রচলিত আছে। এই পক্ষীটিকে নিয়ে অতি জনপ্রিয় কয়েকটি প্রবাদ হ'ল—

(১) বেল পাকলে কাকের কি, ঠোকরালে আর পাবে কি (নাগালের বাইরের

জিনিষ নিয়ে লাফালাফি অর্থহীন)।

(২) ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি (লোভনীয় জিনিষ দিয়ে বহুজনকে আকর্ষিত করা)।

(৩) কাক ভিজা (অতিমাত্রায় আর্দ্র হওয়া)।

(৪) কাক-কোকিলের সমান দর (ভালমন্দের মধ্যে তারতম্যের অভাব)।

(৫) কাকের ছাঁ বকের ছাঁ / কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং (নিম্ন মানের হস্তাক্ষর)।

(৬) কাক স্নান (নামমাত্র শরীর ভিজানো) ইত্যাদি।

চুরি কর্মে অভ্যস্ত কাককে নিয়ে একটি প্রবাদ 'একি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসীমালা' —রূপকার্থে কাক এসেছে এই প্রবাদে। পরিচিত স্বভাবের বিপরীত লক্ষণ দেখলে আমরা বিস্মিত হই।

ছোঁমারা কাকের স্বভাব। অতি লোভী মানুষের চরিত্র বর্ণনায় এই প্রবৃত্তির উল্লেখ দেখা যায়। ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁমারে। নিঃসম্বল মানুষের কিছু হারাবার ভয় থাকেনা এই প্রসঙ্গে কাক এসেছে প্রবাদে— 'মরা কাকের আবার মড়কের ভয়।

একের শাস্তি অপরে ভোগ করবার ঘটনা সংসারে প্রায়ই ঘটে— 'ধান খায় কাকে, বেঙের পায় দড়ি'। অপ্রয়োজনে শক্তির বিনাশ ঘটলে বলা হয়— 'কাকের উপর কামানের চোট।' কানপাতলা লোকেদের প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদে কাক এসেছে— 'কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পিছে ধাবমান।'

প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করি। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত প্রবাদটি হলো— 'কাকের ডিম সাদা হয়, বিদ্বানের ছেলে গাধা হয়। আমাদের ভোর হয় কাকের রায়ে কিন্তু কাক নাডাকলেও ভোর হবেই তাই প্রবাদে বলা হয়েছে।

যে দেশে কাক নেই, সে দেশে কি রাত পোহায়না। অর্থাৎ সংসারে কেউই অপরিহার্য নয়।

চতুর কাকের যে বুদ্ধি তার পরিচয় আমরা কোকিলের চতুরালীতে দেখি পাই। প্রবাদেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়— কাকের বাসায় কোকিল হ'ল, দিন পেয়ে সে উড়ে গেল।

কাক কে নিয়ে কয়েকটি প্রচলিত প্রবাদ ঃ (ক) শহুরে কাক বড় চালাক, (খ) শগুণ মরে ঝড়ে, বাসার কাকও নড়ে, (গ) কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে, (ঘ) কাক এল শেখাতে, কাঁচকলা নিয়ে কানবেঁধাতে।❑❑

আকাশ ছুঁতে চাই

রুমকী দাস
প্রাক্তন ছাত্রী

সেদিনের ফুটফুটে মেয়ে নবনীতা ধর এখন কাজ শিখছে দুঁদে উকিল দেবী পালের জুনিয়র হিসেবে। চেন্নাইয়ের ত্রিবেনী একাডেমীর আবাসিক স্কুলে পড়ে, প্লাস টু শেষ করে দক্ষিণ কলকাতার ল' কলেজ থেকে এল এল বি করেছে।

নবনীতার খুব ভাল লাগে বই পড়তে, অজানা দেশ দেখতে, গান শুনতে আর ভালো লাগে স্বপ্ন দেখতে। বয়স তার এখন সবে ২৩ বছর। এরমধ্যে কি কখনও তার মনে হয়েছে-একেই বলে সাফল্যের আকাশ ছোঁয়া। একেক সময় মনে হয়েছে আকাশটা বোধহয় ছুঁতে পেরেছি। যখন আইনের ডিগ্রিটা হাতে পেয়েছে বা তারপর যখন শ্রদ্ধেয় দেবী-পালের জুনিয়র হয়েছে তখন তার মনে হয়েছে এসব তো বাস্তব অভিজ্ঞতা। কোথায় যে স্বপ্নের মুহূর্ত যা বাস্তব হলে অবশ্যই মনে হবে নবনীতার সাফল্যের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে চড়েছি আমি পৃথিবীর চূড়ায়—

স্বপ্ন নং ১ ঃ যেদিন আমি আমার প্রথম কেস জিতে আসব।

স্বপ্ন নং ২ ঃ যেদিন আমার এল এল এম শেষ হবে।

স্বপ্ন নং ৩ ঃ যেদিন আমি নিজের পছন্দের হীরের নেকলেশ কিনব আর অবশ্যই সেটার দাম হবে কয়েক লক্ষ টাকা।

স্বপ্ন নং ৪ ঃ যেদিন আমি আমার লাল রঙের চকচকে বি.এম. ডব্লিউ চালিয়ে ঘুরতে বের হব।

স্বপ্ন নং ৫ ঃ যেদিন মাকে নিয়ে বিদেশ ভ্রমনে যাব, অফকোর্স নিজের পয়সায়।

স্বপ্ন নং ৬ ঃ যেদিন আমি বিয়ে করব আমার পছন্দের পুরুষকে।

সত্যি! স্বপ্ন কি বাস্তব হবে না কল্পনাই থেকে যাবে? যেদিন সে নিজেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেদিনই সে মনে করবে আকাশ ছুঁতে পেরেছে বলে। যতদিন না তার স্বপ্ন পূরণ হয় ততদিন সে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাববে কবে 'আমি তোমাকে ছুঁতে পারব? আমার স্বপ্ন সত্যি হবে তো?' নবনীতা শুনেছে, যা চাই না তা পেয়ে যাই; আর যা পাই তা চাই না। মানুষের আশার শেষ নেই। নবনীতার বড় আশা যেদিন তার সব ইচ্ছে পূরণ সেদিন তার পা মাটিতে থাকবে না। সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, আজ মনের জোর ও ঈশ্বরের জন্য সে এতটা এগিয়ে যেতে পেরেছে। সত্যিই কি যে আকাশ ছুঁতে পারবে? নবনীতার মন পাখী হয়ে উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর থেকে দূরে ..... দূরে .... অনেক দূরে ..... নীল আকাশের বুকে।❑❑

শুভ্র শেফালির ফুল নিয়ে

নীলিমা গোস্বামী শর্মা
অধ্যাপিকা, অসমীয়া বিভাগ

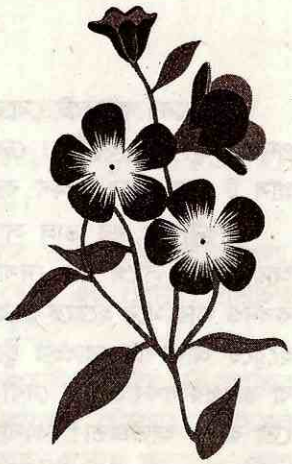

আসলে
আমি তোমাকে ভালবাসি

সেজন্যে এত আয়োজন

হাতে
শুভ্র শেফালির ফুল নিয়ে
করেছি আমন্ত্রণ।❑❑

গোলাপ ফুল

রূপা ভৌমিক
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

ফুলের রাণী গোলাপ তুমি
কতই না সুন্দর।
তোমার গায়ে পাপড়ি গুলো
বড়ই মনোমুগ্ধকর।।
কাঁটার মাঝে থেকেও তুমি
হওনা কখনো দুঃখী।
সদায় তোমায় দেখি তুমি
কেবল হাস্যমুখী।।❑❑

২৬ শে ডিচেম্বর,২০০৪

শিবানী দে
প্রবক্তা, বাংলা বিভাগ

জনসংখ্যা কি এত বেড়ে গিয়েছিল?
পৃথিবীর এর ভার বইবার ক্ষমতা কি হারিয়েছিল?
তাই কি থরথরিয়ে কেঁপে উঠল তার নভস্থল?

হে সমুদ্ররাক্ষস!
তুমি শত বাহুমেলে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে
নিয়ে গেলে লক্ষ লক্ষ লোকের
ধন-জন-প্রাণ!
আমরা শুধু দেখলাম আর ভাবলাম,
এও কি হয়?
প্রকৃতিও কি এত নির্দয়?

তুমি সুনামি...
সত্যিই কি সু-নামী? খুব নামী দামী?
তুমি কি খুব সুনাম পেয়েছো?
নাকি কুনামী?
সবার মনে এই প্রশ্ন, তুমি সুনামী না কুনামী?

কত মা হল শিশুহারা...
কত শিশু হল মাতৃহারা...
কত লোককে করলে গৃহহারা...
কত স্ত্রীকে করলে সিদূর ছাঁড়া...
এত জনকে নিঃস্ব করলে হয়ে অভিমানী...
তুমি সুনামী না কুনামী?❑❑

মুখোশ

হিমাদ্রী রায়
প্রাক্তন ছাত্র

চেহারার অন্তরালে
বীভৎস চেহারা
দেখেছি আমি
তাই, শান্তি নেই মনে
আছে শুধু একরাশ যন্ত্রণা

রাজনীতিকের মিষ্ট কথার অন্তরালে
লুটেরার কদর্যতা
দেখেছি আমি
তাই, শান্তি নেই মনে
আছে শুধু একরাশ যন্ত্রণা।

আজ নয় পড়ে আসবেন,
টাকাটা সঙ্গে নিয়ে আসবেন কিন্তু
ফার্স্ট কাম, ফাস্ট সার্ভ
চটকদার,
চাকরির দোকানদার
সত্তদার নামে ঠকবাজি দেখেছি আমি,
তাই শান্তি নেই মনে
আছে শুধু একরাশ যন্ত্রণা।

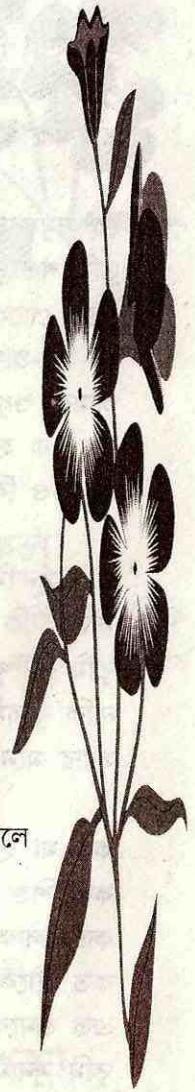

টাকা পয়সা, সোণা দানা, গাড়ীতে
সত্তদা হয়ে গেছে, তাই হবু বঁধুর কপালে
একটি চুমু খেলেন ছেলের মা।
বিয়ের পর গাড়িটা এসে পৌছিল না
তাই নিয়ে অশান্তি, অত্যাচার, কান্না
শেষে একমুঠো ছাই, দেখেছি আমি
তাই শান্তি নেই মনে
আছে শুধু একরাশ যন্ত্রণা।❐❐

সকালে ফুটবে ফুল

অরূপাভ ঘোষ
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

সকালে ফুটবে ফুল
এই ভেবে ভেবে
সারাটা রাত কেটে গেল,
জীবন সন্ধ্যা, জীবন রাত্রি কেটে গেল
সকালের অপেক্ষায়, কিন্তু
এলো কি সকাল? ফুটল কি ফুল?

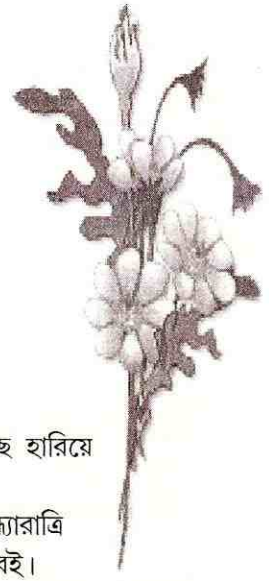

এই জগত বড়ই নির্মম
কেউ যে ভালবাসেনা, ভালবাসাকে
যদি পকেট থাকে ভরা
তাহলেই ভালোবাসে...

ফুলে কিন্তু আজও সেই গন্ধ
তবে ফুলের দর্শকের সেই লালসা গেছে হারিয়ে
আমি তবুও ভালবাসি ফুলকে
যায় যদি যাক, জীবনের তথাকথিত সন্ধ্যারাত্রি
কিন্তু সকাল আসবেই, আমি ভালোবাসবই।
ফুল যে আমার প্রাণ, থাক তুমি আমার কাছে।❐❐

বলতে পারো?

রূপা ভৌমিক
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

বলতে পারো কোকিলের রংটি কেন কালো?
বলতে পারো সূর্য কেন দেয় এত আলো?
বলতে পারো পাখীর কেন আছে দুটি পাখা?
বলতে পারো রামধনুটি কত রং এ আঁকা?
বলতে পারো শীতের সন্ধ্যা কেন হয় তাড়াতাড়ি?
খেলাধূলা শেষ না করেই ফিরতে হয় বাড়ী।❐❐